ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

উত্তর: রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের একটি বিচার বিভাগ। আর বাংলাদেশের অধস্তন আদালতসমূহ বিচারিক সেবা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সাধারণত বেশিরভাগ মামলাই এখতিয়ারসম্পন্ন অধস্তন আদালতে শুরু হয়। দেশে বিচারাধীন মোট মামলার অধিকাংশই (৮৬%) এই অধস্তন আদালতগুলোতে বিচারাধীন রয়েছে। কিন্তু দেশের আদালতগুলোতে নানা সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান যা বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রধান বিচারপতিদের বক্তব্যে বিভিন্ন সময়ে প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের মধ্যে ধারণা রয়েছে যে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হলেও নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক অধস্তন আদালত এখনও প্রভাবিত হওয়ায় সত্যিকারের স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার জন-আকাঙ্ক্ষা এখন পর্যন্ত পূরণ হয়নি। বিচার ব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবি দীর্ঘদিন যাবৎ দেশের বিভিন্ন আদালত ও বিচারিক সেবা খাত নিয়ে গবেষণা ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় অধস্তন আদালতে সুশাসন নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালনে এই গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার লক্ষ্য কি?

উত্তর: বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনার মাধ্যমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করে চ্যালেঞ্জসমূহ থেকে উত্তরণে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনদের বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করার মাধ্যমে বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন ও স্বচ্ছতা সুদৃঢ় করতে সহায়ক ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি?

উত্তর: এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসন পরিস্থিতি পর্যালোচনা, চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণে সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণাটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো-

- বাংলাদেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা পর্যালোচনা করা,
- বাংলাদেশের আদালত ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার চর্চার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করা এবং
- অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ও বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার পরিধি কি কি?

উত্তর: এই গবেষণায় শুধু জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধস্তন আদালত ব্যবস্থার কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সুশাসনের কয়েকটি নির্দেশক- সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচারের আলোকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য কি সমানভাবে প্রযোজ্য?

উত্তর: এই গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম-দুর্নীতি ও সুশাসনের ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সকলের জন্য সমভাবে প্রয়োজন্য নয়। বিভিন্ন কাজের জন্য ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের যে পরিমাণ উপস্থাপিত হয়েছে তা মুখ্য তথ্যদাতাদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী সন্নিবেশিত এবং এই তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য থেকে কোনো সাধারণীকরণ সম্ভব নয়, তবে দেশের অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং ফলাফল সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ৬: এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস কি?

উত্তর: এটি একটি মূলত গুণগত গবেষণা। দেশের মোট ৮টি বিভাগীয় জেলা শহর এবং বাকী ৫৬টি জেলা থেকে বিভাগীয় প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে আরো ১০টি জেলাসহ মাট ১৮টি জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জেলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মামলার সংখ্যার আধিক্য বিবেচনা করা হয়েছে। এইগবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে সংগৃহীত হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে অধস্তন আদালতের বিভিন্ন পর্যায়ের বিচারক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিচারপ্রার্থী,আইনজীবী, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী, আইনজীবীর

সহকারী বা মুহুরী, জেলা আইনগত সহায়তা কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট মোট ৪৩৭ অংশীজনের নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আইনজীবী ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে নয়টি দলগত আলোচনাসহ গবেষণার আওতাভুক্ত আদালতসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ তথ্যের পরোক্ষ উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: এই গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই-বাছাই ট্রায়াঙ্গুলেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। কমপক্ষে তিনটি ভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এর সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। একই তথ্য একাধিক সূত্র হতে সংগ্রহ এবং একটি উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য অপর একাধিক ভিন্ন উৎসের সাথে মিলিয়ে নেওয়া এবং প্রয়োজনে একই তথ্যদাতার কাছে একাধিকবার ফিরে যাওয়া প্রভৃতি পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় সার্বক্ষণিকভাবে মাঠে অবস্থান করে তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া পরিবীক্ষণ করা হয়।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণার সময়কাল কি?

উত্তর: জানুয়ারি-অক্টোবর ২০১৭ সময়ে এ গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৯: এই গবেষণার সীমাবদ্ধতাসমূহ কী?

উত্তর: এ গবেষণায় ক্ষেত্রবিশেষে তথ্যদাতারা তথ্য প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এছাড়া কিছুক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কিছু অফিস থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগাযোগ করেও তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এসকল অংশীজনদের নিকট থেকে তথ্য পাওয়া গেলে এ প্রতিবেদনটি আরো সমৃদ্ধ হত।

প্রশ্ন ১০: এই প্রতিবেদনে কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের অধস্তন আদালত ব্যবস্থা- জেলা ও দায়রা জজ আদালত, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, মহানগর দায়রা জজ আদালত, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও বিভিন্ন ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনদের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় অধস্তন আদালতসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনি সীমাবদ্ধতা; দ্বৈত প্রতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জসমূহ এবং অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঘাটতিসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বিচারক ও কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ; রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীদের নিয়োগ এবং আইনজীবীদের সনদ প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহের পাশাপাশি অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও শুদ্ধাচার চর্চার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ১১: টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

উত্তর: গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি দেখা যায় তা হলো, নানা সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও অধস্তন আদালতগুলো সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অধস্তন আদালতের ওপর একইসাথে সুপ্রীম কোর্ট এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের কারণে অধস্তন আদালতের প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘসূত্রতা ও প্রশাসনিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টিসহ বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে ঝুঁকি সৃষ্টি হচ্ছে। অধস্তন আদালত ব্যবস্থায় অবকাঠামো, লজিস্টিকস, বাজেট, জনবল ও প্রশিক্ষণ, কার্যকর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার ঘাটতি রয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বিচার ও প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাজে ঘুষ বা নিয়ম বহির্ভূত অর্থের লেনদেনসহ নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়ম হচ্ছে। বিভিন্ন অংশীজনদের মধ্যে যোগসাজশের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রবণতা রয়েছে। বিচারপ্রার্থীরা নানাবিধ হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। সুশাসনের ঘাটতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হওয়াসহ দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে বিচারপ্রার্থীদের ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা ব্যাহত হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মামলার দীর্ঘসূত্রতা এবং দুর্নীতির মাত্রা বৃদ্ধি একটি অপরটির পরিপূরক হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে।

প্রশ্ন ১২: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত সকল প্রতিবেদন সকলের জন্য উন্মুক্ত। ইতোমধ্যে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ উপস্থিত সকলের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া একই দিনে মূল প্রতিবেদনসহ সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয় এবং যেকোনো ব্যক্তি ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারে।